মনস্তত্ত্ব, ভাষা ও বঙ্গাল সংস্কৃতি

মঈন চৌধুরী

সম্পাদনা
শওকত হোসেন

মনস্তত্ত্ব, ভাষা ও বঙ্গাল সংস্কৃতি

গ্রন্থের সূচি

মনস্তত্ত্ব, ভাষা ও বঙ্গাল সংস্কৃতি
০৩ - ০৯
ভাষা ও সংস্কৃতি
০৯ - ১৭
প্রকৃতি ও সংস্কৃতি
১৭ - ১৮
সমাজ ও সংস্কৃতি
১৯ - ২৫
অর্থনীতি ও সংস্কৃতি
২৫ - ২৬
অনুচিন্তন
২৬ - ২৭
সংযোজন
২৭ - ২৯

মনস্তত্ত্ব, ভাষা ও বঙ্গাল সংস্কৃতি

পূর্বকথা

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি আছে, খুব সঠিকভাবে সংস্কৃতির সব উপাদানকে এক সাথে করে একটা সংজ্ঞা দাঁড় করানো আসলেও মুশকিল। 'সংস্কৃতি' শব্দটা নিয়েই কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমাদের মাঝে ছিল, এখনো আছে। কেউ কেউ মনে করেন, 'কৃষ্টি' শব্দটি দিয়ে একটি জাতি কিংবা সমাজের মূল্যবোধ, ভাষা, সাহিত্য, আচার, আচরণ, রীতি-নীতি, উৎসব-পার্বণ ইত্যাদিকে যেভাবে বোঝানো যায়, সংস্কৃতি শব্দটি দিয়ে ঠিক একই মাত্রার দ্যোতনা আনা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষপাতিত্ব থাকায় ইংরেজি culture শব্দটির বিপরীতে 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলা ভাষাতে মোটামুটিভাবে স্থান

করে নিয়েছে। তবে এ কথাও সত্য, এখনো আমরা অনেকেই 'সংস্কৃতি' বোঝাতে 'কৃষ্টি' শব্দটিও ব্যবহার করি।

কোলকাতা ও শান্তিনিকেতন-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি-চর্চা একসময় 'সংস্কৃতি' শব্দটির মর্মার্থ নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলে, সংস্কৃতির বিকাশ বা চর্চার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে যায় 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানসমূহের আনুষ্ঠানিকতা। এখনো আমাদের সমাজের অনেক শিক্ষিত লোকই 'সংস্কৃতি-চর্চা' বলতে গান-বাজনার আসরকেই বোঝাতে চান। সংস্কৃতি বা কৃষ্টি যে তাদের জীবন ও চরিত্রের উপাদান হয়ে তাদের মাঝেই অবস্থান করছে, তা উপলব্ধি করাও তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' এবং 'কৃষ্টি' নামক দুটি শব্দ আছে, কিন্তু দ্যোতক হিসেবে শব্দ দুটির সঠিক দ্যোতিত রূপ আমাদের চেতনসত্তায় কেন পৌঁছাচ্ছে না, তা বিচার-বিশ্লেষণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের জ্ঞানী-গুণীজন বাঙালি বা বঙ্গাল সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করেছেন প্রচুর; বিভিন্ন সত্য, অর্ধসত্য এবং মিথ্যা অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তও তারা উপস্থিত করেছেন যৌক্তিকভাবেই, কিন্তু সংস্কৃতি বা কৃষ্টির আসল দ্যোতিত অর্থকে বাঙালি/বঙ্গাল চেতনা-চৈতন্যে উপস্থিত করতে পারেনি কখনোই। আমরা Cultured/uncultured যুগ্ম-বৈপরীত্যটিকে যে মাত্রায় বিচার-বিশ্লেষণ করি, ঠিক একই মাত্রায় সংস্কৃতি/অপসংস্কৃতি যুগ্ম-বৈপরীত্যকে বিচার-বিশ্লেষণে আনি না। কেন আনি না, এই প্রশ্নের উত্তরে যথাযথ যুক্তি দাঁড় করাতে গিয়ে আমাদের জ্ঞানীগুণীজন সব সময় ধর্ম, সামাজিক বিভেদ, জাত-পাত-কেন্দ্রিক বিভাজন ইত্যাদিকে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু সংস্কৃতির উৎসমূলে অবস্থানরত মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণে আনেননি।

সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সাথে যে সমাজ-মনস্তত্ত্বের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা আমাদের জ্ঞানীগুণীজন যৌক্তিকভাবে কখনই উপলব্ধি করেননি, এবং এর কারণ হল 'সংস্কৃতি' শব্দটিই ছিল বঙ্গাল বা বাঙালিদের কাছে খুবই নতুন। ১৯২২ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্যারিস গিয়ে তার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে জানতে পারেন যে, মারাঠি ভাষায় Culture শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃত' শব্দটির প্রচলন আছে। দেশে ফিরে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ বিষয়ে অবহিত করলে রবীন্দ্রনাথ Culture শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় একটি নতুন শব্দ 'সংস্কৃতি' যোগ হল বটে, কিন্তু শব্দটির ব্যাখ্যায় ঘুরে ফিরে ইংরেজি শব্দ Culture-এর উপাদানসমূহই প্রাধান্য পেল। এ সময় 'সংস্কৃতি' শব্দটির সাথে অল্পসল্প ভারতীয় উপাদান যোগ করার তাগিদে আত্মার অধিতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বও নিয়ে আসা হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষ্য উল্লেখযোগ্য, তিনি লিখলেন–

"শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ।" (ছন্দ : রবীন্দ্র রচনাবলী, ঢাকা-১৪০৬)।

"...তার [মানুষের] সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি"। ('সাহিত্যের পথে': রবীন্দ্র রচনাবলী, ঢাকা ১৪০৬)।

রবীন্দ্রনাথের 'সংস্কৃতি চিন্তা'কে বিশ্লেষণ করে কিছু মৌলিক এবং যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। প্রশ্নগুলো হল :

ক. আত্মসংস্কৃতি আর শিল্প কিংবা শিল্পবোধ কি একই উপাদান?
খ. পরিবেশ, প্রকৃতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদিকে বিচার-বিশ্লেষণে
না এনে শুধুমাত্র আত্মার সংস্কারে সাংস্কৃতিক বিকাশ কি আদৌ সম্ভব?
গ. ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' কি একটি
অধিতাত্ত্বিক বাণী নয়? যদি এই বাণীতে যুক্তি থেকে থাকে, তবে কি
আমাদের সংস্কৃতির সাথে শুধুমাত্র সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে যদি যুক্তিকে টেনে আনি তবে আমাদের অবশ্যই বলতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-চিন্তা আমাদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেনি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তার রচিত 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে আবার 'এগিয়ে চলার' সাথে 'সংস্কৃতি'র সম্পর্ক স্থাপন করে ঐতরেয় মন্ত্র 'চরৈবতি'র প্রসঙ্গ টেনেছেন।
মন্ত্রটি হল :
চরণ বৈ মধু বিপুতি চরণ স্বাদুমুদুম্বরম।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো না তন্দ্রয়তে চরণ॥
চরৈবতি চরৈবতি॥

(চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।)
সংস্কৃতিকে (Culture) কেন্দ্র করে একসময় সভ্যতার (Civilization) সৃষ্টি হয়। মানুষ এগিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এই একই সংস্কৃতি 'এগিয়ে যাওয়ার' সাথে বিরোধ (Conflict) সৃষ্টি করে মানুষের সভ্যতাকে নষ্টও করে ফেলতে পারে। এ সত্য ঐতরেয় মন্ত্র-জাত ক্ষিতিমোহন সেন-এর বয়ান বা text-এ স্থান পায়নি। সংস্কৃতি-সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বিভিন্ন অধিতাত্ত্বিক (metaphysical) উপাদান নিয়ে আসেন এবং তিনি কিছু যুক্তি আর কিছুটা অযুক্তি মিলিয়ে লিখেন :
"পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতির বা জনগণের মধ্যে আছেই, কিন্তু আমরা ক্রমে উপলব্ধি করতে পারলুম, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি, প্রভৃতির অতিরিক্ত আর-একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তরপ্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, আর-

একদিকে তার বাহ্য-সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটির নামকরণ হয়েছে ইংরেজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপী ভাষায় Culture (জরমান kultur 'কুলতুর') শব্দ রূপে।... আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি, একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তরপ্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তা হচ্ছে Culture।"

> "ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি একাধারে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণা-রূপে আর তার প্রকাশ-রূপেও বিদ্যমান।"
>
> (সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৬)

সুনীতিকুমার কথিত 'আভ্যন্তরপ্রাণ বা অনুপ্রেরণা' কিংবা 'ভাবপুঞ্জ' ইত্যাদি কোনোভাবেই সংস্কৃতির আসল রূপ ও স্বরূপকে আমাদের কাছে তুলে ধরে না। এ সময় সংস্কৃতির কিছুটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখলেন :

"রবীন্দ্রনাথ Culture বলতে বুঝতেন শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি, ভব্যতা, ভদ্রতা, চিত্তোৎকর্ষ, refinement ইত্যাদি; একান্ত জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য যে স্থূল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম ও তার ফলশ্রুতি, তাকে তিনি Culture বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন।"

"সুনীতিবাবুর সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় রচনাদি থেকে মনে হয়, তিনিও এই ধরনের মতই পোষণ করতেন।"

"মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সেই মানবশিশুর সঙ্গে একটি পশুশাবকের কোনও পার্থক্য বড় একটা থাকে না। কিন্তু তার পর থেকেই মা-এর ও পরিবারের কোলে সে যখন বাড়তে থাকে, তখন খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, শোয়া, বসা, চলা থেকে পদে পদে স্তরে স্তরে তার সংস্কারসাধন চলতেই থাকে; বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শিক্ষাদীক্ষাও সেই সংস্কারক্রিয়ারই অন্তর্গত। শরীরচর্চা, জ্ঞানচর্চা, শিল্পসাহিত্যচর্চা, গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্গে তার আদান-প্রদানক্রিয়া ইত্যাদিও তার নিজকে ক্রমশ উন্নততর, ক্রমশ বেশি সংস্কৃত করবার অবিরাম প্রয়াস। যে-জীবন ছিল প্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মশাসিত-মাত্র তাকে সজ্ঞান সচেতন চেষ্টায় বিচিত্রকর্মের বিচিত্রতর নিয়ম-সংযমের শাসনে ক্রমশ সংস্কৃত করে তোলা। তাছাড়া, জীবনের পথে চলতে চলতে সংসারের দৈনন্দিন কর্মের রথচক্রে নানা মালিন্য, নানা আবর্জনা জমতেই থাকে। মালিন্য ও আবর্জনা শুধু ধুলোবালি-কালি নয়, শুধু মৃত খড়কুটো নয়, অভ্যাসের মালিন্য আছে, অর্থবোধহীন আবৃত্তিরও আবর্জনা আছে, ব্যবহারে-ব্যবহারেও ক্ষয় আছে। সেজন্য প্রতিনিয়তই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টা রাখতে হয়, জীবনকে ক্ষয়, মালিন্য ও আবর্জনামুক্ত রাখবার জন্যে, এই সচেতন সজ্ঞান ক্রিয়াও সংস্কার-ক্রিয়া, এবং এই ক্রিয়ার যে ফললাভ ঘটে তাকেই তো আমরা বলি সংস্কৃতি।" (কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৯)।

নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্কৃতি-বিষয়ক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমকেও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করেন, এবং জীবনের ক্ষয়, মালিন্য ও আবর্জনামুক্ত রাখার সজ্ঞান সংস্কার ক্রিয়াসমূহের ফলকেই 'সংস্কৃতি' হিসেবে চিহ্নিত করেন। নীহাররঞ্জন রায় কথিত ক্ষয়, মালিন্য এবং আবর্জনা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক

বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিলেও, শ্রী রায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেননি। পবিত্র সরকার তার দেয়া 'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যায় বলেন–

"মানুষ আসার আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, আর মানুষ আসার পর পৃথিবীর যে অবস্থা দাঁড়াল– এই দু'য়ের তফাতই হলো সংস্কৃতির তফাত। পৃথিবীর জীবনপ্রতিবেশে মানুষের সৃষ্টি যা কিছু সে সবই 'সংস্কৃতি', বাকিটা হল 'প্রকৃতি'।" (লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯১)

পবিত্র সরকারের দেয়া সংস্কৃতির সংজ্ঞা আসলে 'সভ্যতার' সংজ্ঞা। পবিত্র সরকারের কাছে Culture এবং Civilization হয়তো-বা একই মাত্রার দ্যোতনা নিয়ে এসেছিল এবং এর ফলে 'সভ্যতার তফাত'কে তিনি 'সংস্কৃতির তফাত' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক গোপাল হালদার সংস্কৃতি-কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন–

"মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি;"...

"জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিরও তেমনই পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, অর্থাৎ তার পরিবর্তন চলে।"

"সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। ...সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়– চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবই বুঝায়,– তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি–মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।" (সংস্কৃতির রূপান্তর, কলিকাতা, ১৯৬৫)

গোপাল হালদার-এর ব্যাখ্যায় সংস্কৃতির বিবর্তন বা metamorphosis-কে স্বীকার করা হয়েছে এবং সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে উপস্থিত হয়েছে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা 'সৃষ্টি' ও মানুষের জীবন-সংগ্রামের সমগ্র প্রচেষ্টা।

সংস্কৃতির সর্বশেষ বিচার, বিশ্লেষণ ও ইতিহাস আমরা পাই গোলাম মুরশিদ রচিত 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' গ্রন্থে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি লিখেন :

"উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এডওয়ার্ড টেইলর সংস্কৃতির যে-সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা বিবেচিত হয় ধ্রুপদী সংজ্ঞা বলে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, মানুষের বিশ্বাস, আচার, আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যাটার্নকে বলা যায় সংস্কৃতি। ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্ম ও বিশ্বাস; রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন; উৎসব ও পার্বণ; শিল্পকর্ম; এবং প্রতিদিনের কাজে লাগে এমন হাতিয়ার ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই সংস্কৃতি। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব শিক্ষা, সামর্থ্য এবং অভ্যাস আয়ত্ত করে– তাও সংস্কৃতির অঙ্গ।"

"জন্মের সময়ে আমরা একটি জন্তু হয়ে জন্মাই। কিন্তু সংস্কৃতিই আমাদের মানুষে পরিণত করে। পরিণত করে সামাজিক জীবে। সংস্কৃতি দিয়েই একটা মূল্যবোধ, মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণার অধিকারী হই। বিদগ্ধ রুচির সুশীল মানুষে পরিণত হই। আবার, তেমন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত হলে সাধারণ মনুষ্য-সন্তানও জন্তুতে অর্থাৎ অমানুষে পরিণত হতে পারে। এককথায়, সংস্কৃতির কারণেই আমরা যা হই, তা হই।" (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ঢাকা, ২০০৬)

গোলাম মুরশিদ কর্তৃক উদ্ধৃত এডওয়ার্ড টেইলর-এর সংস্কৃতি-বিষয়ক সংজ্ঞা ধ্রুপদী হলেও, সংস্কৃতির সাথে সমাজ-মনস্তত্ত্বের সম্পর্ককে উপস্থাপন করে না। লেখকের মতে সমাজ-মনস্তত্ত্ব কিংবা যৌথ-অচেতনের (Collective unconscious) কার্য-কলাপহীন সংস্কৃতি অবস্থান করাই অসম্ভব। গোলাম মুরশিদ-এর বক্তব্য– 'জন্মের সময়ে আমরা একটি জন্তু হয়ে জন্মাই'

(নীহাররঞ্জন রায়ও এমন বলেছিলেন) কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। জেনেটিক কারণে একটি মানুষ মানুষ হিসেবে, একটি বাঘ বাঘ হিসেবে কিংবা একটি গরু গরু হিসেবেই জন্মায়। বাঘ আর গরুর যেহেতু সংস্কৃতি নেই, সেহেতু বাঘ আর গরুর পক্ষে 'মানুষ' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু মানুষের সংস্কৃতি থাকার কারণেই 'অমানুষ' হয়ে যেতে পারে। গোলাম মুরশিদ এই সত্যটি স্বীকার করে লিখেছেন– 'আবার, তেমন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত হলে সাধারণ মনুষ্য-সন্তানও জন্তুতে অর্থাৎ অমানুষে পরিণত হতে পারে। এককথায়, সংস্কৃতির কারণেই আমরা যা হই, তা হই।' আমরা 'যা হই, তা হই' কেন, এ প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না দিয়েই মুরশিদ রচনা করেছেন তার প্রথাগত হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস। (হাজার বছর আগে বঙ্গদেশে আদি-অস্ত্রাল-দ্রাবিড়-আলপীয়-ইউরোপয়েড মিশ্র জনগোষ্ঠীর বঙ্গালরা বসবাস করতো। তাদের ভাষা হয়তো বাংলা ছিল না। কিন্তু ঐ আদি বঙ্গালদের ভাষার উপাদান এবং যৌথ-অচেতনের প্রত্নলেখ যে এখনো আমাদের মাঝে নেই, তা হলফ করে বলা যাবে না। সবকিছু বিবেচনা করে বঙ্গাল বা বাঙালির সব ধরনের ইতিহাসে আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ আনাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।) বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাতের কাছে না পেলেও কবি ও প্রাবন্ধিক পুষ্কর দাশগুপ্তের একটি লেখা আমাদের সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়কে কিছুটা হলেও তুলে ধরেছে বলে মনে হল। ভারতীয়ত্বের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে পুষ্কর লিখেছেন :

"অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমি অবশেষে এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, ভাষা, ধর্ম, আচার-বিচার ইত্যাদির ব্যবধান পেরিয়ে সারা ভারতে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য যদি থেকে থাকে তাহলে তা হল ভণ্ডামি। ভারতীয় (বাঙালি বলে আলাদা না করে) সমাজের সর্বস্তরে ভণ্ডামির অবাধ রাজত্ব আর ভণ্ডামি এই সনাতন দেশে সর্বধর্মসম্মত, সমস্ত স্মৃতি এবং নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত। ধর্মবাক্য, নীতিবাক্যের আড়ালে চুরি, চামারি, ফেরেব্বাজি করে যাও, ভেজাল দাও, কালো পয়সার পাহাড় বানাও– আড়াল থাকলেই হল। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, ব্যক্তিগত সুবিধা বা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, খুন-জখম, জাল জুয়োচুরি, কালো-বাজারি সব করে যেতে পার, তবে তারপর তুমি যদি ঘটা করে তেত্রিশ দেবতার পুজো দাও, হজ করে আস, মন্দির, মসজিদ কি গির্জা বানাও তাহলে সমাজ, জাতি, ধর্ম তোমাকে বাহবা দেবে, মাথায় তুলে নাচবে। ইদানীংকালে আরো নতুন পথ হয়েছে, যে করে হোক নিজের ধান্দা দেখ, অত্যাচার-অনাচার যা পার কর, আখের গুছোও তবে মুখে জনসেবার, গণতন্ত্রের বুকনি কপচাতে হবে, পার তো সমাজতন্ত্র, গরিব হটাও ইত্যাদি হুংকার দিয়ে যাবে। ব্যক্তিগত জীবনে যত পার দুর্নীতি করে যাও, লাম্পট্য কি হরেক রকমের বদমাইসিও করে যেতে পার, শুধু নীতির মালাজপটা যেন ঠিক থাকে, সৎ সংসারীর ভেকটাও পরিপাটি রাখতে হবে– ডুবে ডুবে জল খেলে ভারতীয় সমাজ নামক শিবঠাকুরের বাপও তা দেখতে পায় না, অতএব কোনো ঝামেলা নেই।" (দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা, ১৯৯৫)

পুষ্কর দাশগুপ্ত যে চারিত্রিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন, তাই হল বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতির মাঝে অবস্থানরত অস্তিত্বের-সংকট-কেন্দ্রিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, এবং লেখক মনে করে যে, বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত যৌথ-অচেতনের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সংস্কৃতি বিষয়ক আসল মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে উপস্থাপন করা সম্ভব। সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে অবস্থান করে ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনীতি। সংস্কৃতির অংশ হয়ে

মানুষের যে আচার, ব্যবহার, ভদ্রতা-নম্রতা, পূজা-পার্বণ, শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত-নৃত্যকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির মতো উপাদানসমূহের উপস্থিতি থাকে, তার মূলেও অবস্থান করে মানুষের ভাষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতি। এখানে উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে কার্যরত ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষের মনোজগতকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং মনস্তত্ত্বের উপাদান 'যৌথ-অচেতন'-ই সংস্কৃতির সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হয়ে ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, নিয়মকানুন, উৎসব ও পার্বণ, শিল্পকর্ম ইত্যাদি অবস্থান করলেও, সর্বকর্মেই অবস্থান করছে আমাদের 'যৌথ-অচেতনের' ক্রিয়া-বিক্রিয়া, এবং এই মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াই আমাদের সংস্কৃতিতে নিয়ে এসেছে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, ভণ্ডামি এবং বিভিন্ন অস্তিত্বকেন্দ্রিক সঙ্কট। বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের তাই ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনীতিকেও বিচার-বিশ্লেষণে আনতে হবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি

বাংলা ভাষাই হল বঙ্গাল বা বাঙালি, অস্তিত্বের একক উপাদান, যা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে আগামীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ক্ষণজন্মা মনীষা এ সত্যটি বুঝে লিখেছিলেন–

"বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিলো তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিলো না। তবু এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।"

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'অন্তরের ভাগ' আসলে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং ভাষার উপাদান হয়েই এই 'অন্তরের ভাগ' বা 'মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব' আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করে রেখেছে। ভাষার সাথে মানবিক সত্তার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন দার্শনিক হাইডেগার। হাইডেগার-এর মতে, মানবজীবনের অর্থই হল ভাষার মাধ্যমে সত্তার মর্মার্থ, সম্ভাবনা আর গুরুত্বকে প্রকাশ করা এবং তিনি তার দর্শনে বেশ জোর দিয়েই ঘোষণা করেন Language is the house of Being, man dwells in this house। ভাষার সাথে মানব-সত্তা ও মানব-মনস্তত্ত্বের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটান ভাষা-দার্শনিক জাক লাকাঁ। ফ্রয়েড-এর মনস্তত্ত্বের মূল কাঠামোসমূহ গ্রাহ্য করেই জাক

লাকাঁ তার দর্শনের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন এবং তিনি প্রয়োজনমতো ক্লদ লেভি স্ট্রাউস, জাক দেরিদা আর মার্টিন হাইডেগার-এর দর্শনকেও মূল্যায়ন করেছেন তার দর্শনচিন্তায়। লাকাঁর দর্শন অনুযায়ী মানুষের অচেতন হল ভাষা-শৃঙ্খলে তৈরি, এবং এ কারণে একটি মানুষ সবসময় ভাষার রূপক ও প্রতীক সৃষ্টি করে তার অবদমিত অচেতনকে প্রকাশ করতে চায়। জন্মের পর একটি মানুষ তার প্রয়োজন (Need) ও চাহিদা (Demand) কেন্দ্রিক অকৃত্রিম (Real) এবং কল্পিত (Imaginary) পর্ব পেরিয়ে যখন ভাষা-সৃষ্ট প্রতীকী (Symbolic) বিশ্বের সদস্য হয়ে যায়, তখন তার অবদমিত কামনা-বাসনা-জাত ভাষা প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপক আর প্রতীক-কেন্দ্রিক দ্যোতক (Signifier) সৃষ্টি করেই এগুতে থাকে। একজন অবদমিত মানুষ কিংবা অবদমিত সমাজ-সংগঠনের ভাষায় সবসময় তাই অবদমনসহ বিভিন্ন মানসিক অবস্থার চিত্রকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল ইয়ুং কথিত যৌথ-অচেতন বা Collective unconscious-এর ক্রিয়া-কলাপ। ফ্রয়েড-এর অহং (Ego), অদ (Id) ও অতি-অহং (Super Ego) ঘটিত Displacement, Repression, Intellectualization, Compensation, Rationalization এবং Sublimation-এর বিষয়গুলোও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাষা ও সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত অচেতনের সৃষ্টিশীল কামনা-বাসনা সবসময় কাজ করেছে এ কথা সত্য এবং আমরা এ সত্যও জানি যে, অবদমিত অচেতনই মানুষকে সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে। কিন্তু, অবদমিত সৃষ্টিশীল বঙ্গাল কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের কর্মে ও কথায় আমরা অনেক সময় স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, ভণ্ডামি, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদির মতো অসামাজিক উপাদান খুঁজে পাই, যা ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই আমি 'চর্যাগীতি' ও 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর দু'চারটি পদ তুলে দিলাম-

ক.
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী
(ভুসুকু নিজে বাঙালি হয়ে গেল,
নিজের স্ত্রী চণ্ডালে গ্রহণ করলো)

খ.
নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহসো বামহন নাড়িআ।।
(ডোম্বী, নগরের বাইরে তোর কুড়েঘর, তুই ব্রাহ্মণ ও নেড়েকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস।)

গ.
মেহলি চণ্ডালী গরবি বাম্হণ
জন বিটালন্তি তে দুই লাম্বল।

হল সহি কা মঞি অচাভুঅ দিট্‌ঠা
বাম্‌হণ মণুস চণ্ডালিএঁ তুটঠা ॥
(গৃহিণী চণ্ডালী, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ, এই দুই
মিলে জগৎ নষ্ট করেছে। ওলো সখি;
আমি কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, ব্রাহ্মণ
মানুষ চণ্ডালীতে তুষ্ট)
(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭)

উপরিউক্ত পদগুলোতে যে জাত-পাত-কেন্দ্রিক পরশ্রীকাতরতা দেখা গেল, তা ইতিহাস বেয়ে বেয়ে আমাদের বর্তমানেও উপস্থিত আছে। বাঙলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীজনের লেখার কিছু অংশ পাঠকের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য তুলে দেয়া যেতে পারে।

ক.

"নতুন নতুন জাতি ও শ্রেণীগুলির উদ্ভব নির্দেশ করে যে, হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে একটি বিরামহীন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছিল। নিচু জাতিগুলিকে হয়তো কলঙ্ককর অবস্থায় থাকতে হত। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় তাদেরও উপরে ওঠার ও নিজের অবস্থান উন্নয়ন এবং উচ্চতর ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদা অর্জনের সুযোগ ছিল। অতএব লক্ষ করা যেতে পারে যে উচ্চাভিলাষী দলগুলোর গতিশীলতার আন্দোলনের ফলে যে পরিবর্তনগুলো সাধিত হচ্ছিল সেগুলির লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সীমিত। উচ্চাভিলাষীদের চাওয়ার মধ্যে ছিল জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে নীচের তলা থেকে উপরের তলায় উন্নতি ও জাতি-ব্যবস্থার শর্ত অনুযায়ী অধিকতর মর্যাদা। তারা কখনই জাতি-ব্যবস্থার গঠনতন্ত্র নষ্ট করতে চায়নি, বা যে মূল সূত্রগুলোর উপরে ওই গঠনতন্ত্র স্থাপিত তাতে আপত্তি তোলেনি। বস্তুত উঁচু জাতিগুলোর মতোই নিচু জাতিগুলোও জাতিব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় উৎসাহী ছিল। জাতি-সমাজের ভেতরে পরিবর্তনগুলো সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন দলগুলোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং সেই সম্পর্ক নির্দেশকারী নিয়মগুলো অপরিবর্তিতই রয়ে গেল।"
(হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল, বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

খ.

"কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত হইলেন– প্রথম, কুলীন; দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয়; তৃতীয়, বংশজ; চতুর্থ, গৌণ; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়।

কালক্রমে, কুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণিতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণকুলীন-সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।"
(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৌলীন্যমর্যাদার প্রথম ও বর্তমান অবস্থা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

গ.

“যদি কোনো স্থানে আর্যে-অনার্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য-অনার্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙালিরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালি পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালি মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙালিসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙালি অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙালি মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙালিজাতি অমিশ্রিত আর্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।”

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালির উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা ২০০৫)

ঘ.

“ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; রমণীচরিত্রের যতপ্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্যাবর্তভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শপত্নী সীতা, সেই নরলোকের, এমনকি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শীভূতা, মহনীয়-চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।”

(স্বামী বিবেকানন্দ, স্ত্রী-শিক্ষা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

ঙ.

“বৈদিক যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এদেশের লোকের প্রতি একটা অন্যায়-অমূলক-তীব্র ঘৃণা এদেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের একটা বিভেদরেখা টেনে রেখেছিল। এ দেশের লোকদের তারা দস্যু (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ), পক্ষীকল্প (ঐতরেয় আরণ্যক), ম্লেচ্ছ (মহাভারত), পাপাশয় (ভাগবৎ পুরাণ) বলে উপহাস-অপমান করেছে। স্বল্পকালের জন্যও এদের দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দিয়েছে (বৌধায়ন ধর্মসূত্র)। এ দেশের লোকেরা যাতে জ্বরে ভুগে মরে তার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছে (অথর্ব বেদ)। এ দেশের লোকের প্রতি তাদের ঘৃণা এতই তীব্র ছিল। সেন-বর্মণ-দেব আমলে সেই ঘৃণাকারীরাই যখন এ দেশের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হল তখন তাদের প্রতি এ দেশের সাধারণ মানুষের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। আর সাধারণ লোকের প্রতি সেই সমাজবিধাতাদের অত্যাচার-অবিচারের মাত্রাও অনুমানযোগ্য।”

(নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১)

বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির (?) উন্নয়নের আদর্শ ও দর্শন নিয়ে আমাদের জ্ঞানী-গুণীজন যা লিখেছিলেন, তাতে শ্রেণীস্বার্থের বুলি, জাত-পাত-কেন্দ্রিক বিভাজন, পরশ্রীকাতরতা এবং সীতা-রূপ পতিব্রতা রমণী সৃষ্টির উপাদান ছিল যথেষ্ট এবং সেই গ্রন্থিত/মুদ্রিত বাণীসমূহ বিভিন্ন সময় নির্মিত/বিনির্মিত হয়ে আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদমিত অচেতনের প্রত্নলেখ এখনও 'ভাষা' হিসেবেই অবস্থান করছে বঙ্গাল কিংবা বাঙালির 'যৌথ-অচেতনে'। ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি, ২০০৬ সালের 'বর্তমানে' বসবাস করেও বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান করে অযথাই নিজেদের হীনম্মন্যতার প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'গণমুক্তি'র সপ্তম প্রকাশনা 'নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান সংখ্যা' সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। গণমুক্তিতে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো পড়ে মনে হল, নমস্ ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকার গ্রাহ্য করে এখনো বাংলাদেশের নমঃশূদ্ররা ব্রাহ্মণত্ব দাবি করেন। (ব্রাহ্মণত্বের মাঝে কী এমন গুণ আছে যা লাভ না করলে জীবন বৃথা হয়ে যায়? ব্রাহ্মণত্বের এই গুণ নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেননি গণমুক্তির লেখকবৃন্দ)। ব্রাহ্মণত্বের গুণ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা না হলেও, ব্রাহ্মণত্বের দোষ নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে, এবং প্রতিটি লেখাই যৌক্তিকভাবে 'বাঙালি সংস্কৃতির' বিপক্ষে অবস্থান নেয়। শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্মমতে নমঃশূদ্ররা চণ্ডাল (?) হিসেবে পরিচিত এবং এ বিষয়ে 'গণমুক্তি'তে গ্রন্থিত প্রবন্ধের কিছু অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি–

ক.

"কর্ম-সূত্রে কারা চণ্ডাল এবারে সে কথা বলা যাক। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে ৫১-৫৬ শ্লোকে চণ্ডাল জাতির নিম্নরূপ কর্ম বা অনুশাসন বর্ণিত আছে : "চণ্ডাল ও শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রামের বহির্ভাগে হইবে এবং ইহাদিগকে জলপাত্র রহিত করিবে; কুকুর ও গর্দভ মাত্র ইহাদের সম্পত্তি হইবে। (৫১) উহারা পরের বস্ত্র পরিধান করিবে, লৌহের অলংকার ধারণ করিবে এবং একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্বদা পরিভ্রমণ করিবে। (৫২) সাধুরা যখন বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠান করিবেন, তখন ইহাদের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ; ইহাদিগের বিবাহক্রিয়া স্বজাতির মধ্যে সম্পন্ন হইবে এবং ঋণ-দানাদি ব্যবহারও ভদ্রলোকের সহিত না হইয়া স্বজাতির সহিত সম্পন্ন হইবে। (৫৩) ইহাদিগকে অন্ন দিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা অন্যের দ্বারা ভগ্নপাত্রে ইহাদিগকে অন্ন দেওয়াইবেন এবং ইহারা রাত্রিকালে গ্রামে বা নগরে বিচরণ করিতে পারিবে না। (৫৪) রাজ-শাসন অনুসারে ধ্বজ কুঠার চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া স্বকার্য সাধনার্থ উহারা দিবাভাগে ইতস্তত বিচরণ করিবে এবং অনাথ শব গ্রামের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিবে। (৫৫) রাজদণ্ডে যাহারা বধ্য বলিয়া স্থির হইবে, ইহারা তাহাদিগের বধ সাধন করিবে, এবং ঐ সকল বধ্য ব্যক্তির বস্ত্রালংকার ও শয্যা ইহারা গ্রহণ করিবে। (৫৬)"

"জন্মের বিচার ও কর্মের বিচার, এর কোনো বিচারেই যে নমরা ঐরূপ নয়, তা সকলেই জানেন। চণ্ডালের উৎপত্তি শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, অন্যদিকে নমদের উৎপত্তি ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা মাতার গর্ভে। চণ্ডালের পেশা রাজাদেশে বধ্য ব্যক্তির বধ-সাধন ও শবদাহ করণ, অন্যদিকে নমদের পেশা কৃষিকাজ, যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সর্বোত্তম জীবিকারূপে সর্বজন-স্বীকৃত। অথচ বল্লালের আক্রোশে এই নমদের উপর অহেতুক চণ্ডাল খেতাব আরোপিত হয় দ্বাদশ

শতকে। তখন থেকে সামাজিক কাজকর্মে নমদেরকে 'চণ্ডাল' (>চাঁড়াল) বলে গণ্য করা হতো এবং রাষ্ট্রীয় আদমশুমারিতে যে জাতি-ভিত্তিক লোকসংখ্যা দেখানো হতো, তাতে নমদের 'চণ্ডাল' বলে চিহ্নিত করা হতো। শুধু তা-ই নয়, কোনো কোনো গ্রন্থেও 'চণ্ডাল' অর্থে 'নমঃশূদ্র' লেখা হয়েছে।"
(গৌরপ্রিয় সরকার, জাতিতত্ত্ব সংগ্রহ : নমদের কথা, গণমুক্তি, ঢাকা ২০০৬)

খ.

"শূদ্রেরা কি হিন্দু? যদি তারা হিন্দু হয়ে থাকেন, তাহলে কতটা হিন্দু? হিন্দুধর্ম শূদ্রদেরকে অহিন্দু বলেনি, কিন্তু মানুষ হিসেবে কতটা স্বীকৃতি দিয়েছে? শূদ্রদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করলে তাদের সেবাগ্রহণে ধর্মীয় আপত্তি তৈরি হতে পারে, কিন্তু হিন্দুধর্ম অনুসারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের 'অস্পৃশ্য' এবং 'অধম' হিসেবে টিকিয়ে রাখতে পারলে অল্পকিছু শ্রমবিমুখ লোকের জীবনে আরাম অবাধ এবং নিশ্চিত হতে পারে। কালোদের প্রতি সাদাদের মনোভাবে অস্পৃশ্যতা ও দাসত্ব ক্রিয়াশীল থাকলেও তাতে ধর্মীয় অনুমোদন নেই। বরং কালো মানুষেরা খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে পশ্চিমা ধনবাদী সমাজে 'মানুষ' হিসেবে ধর্মীয় এবং সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মীয় বিধিবিধান রচয়িতা–মনু, বশিষ্ঠ, পরাশর, বাৎসায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি প্রমুখ ব্যক্তি সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বর্ণ-প্রথার যেভাবে ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছেন তাতে হিন্দুধর্মে শূদ্রদের কতটা অধিকার স্বীকৃত হয়েছে? শূদ্রদের বেদপাঠ নিষেধ, 'ভগবান' রাম বেদ পাঠের অপরাধে শূদ্রের জিহ্বা কেটে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের মন্দিরে শূদ্রের প্রবেশাধিকার নেই, তাদের উপস্থিতি অপবিত্র, স্পর্শ অশুচি, তাদের ধনসম্পদ সঞ্চয় অনভিপ্রেত।
হিন্দুধর্ম অনুযায়ী শূদ্রের ধন নেই, মান নেই, শিক্ষা নেই, শিক্ষিত হবার চেষ্টা থাকতে নেই, সমাজে স্থান নেই, রাজনীতিতে অধিকার নেই, জীবনের অধিকার পর্যন্ত নেই। ভালো জামাকাপড় তাদের জন্য অনুমোদিত নয়, শূদ্রহত্যা পাখি হত্যার নামান্তর। শূদ্র স্ত্রীর গর্ভের ব্রাহ্মণ-পিতার সন্তান সম্পত্তির সমান অংশীদার হবে না– হবে এক-দশমাংশের অধিকারী। দাসত্ব শূদ্রের চিরন্তন নিয়তি। শূদ্রকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না, কারণ দাস্য তার স্বভাবজাত। মৃত ব্রাহ্মণকে শূদ্র স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণ স্বর্গে যাবে না। এই যখন শূদ্রের অবস্থা তখন শূদ্র কতটা হিন্দু?"
(গোবিন্দ বর, প্রাসঙ্গিক ভাবনা, গণমুক্তি, ঢাকা, ২০০৬)

২০০৬ সালে বাংলা ভাষায় লেখা বঙ্গাল বা বাঙালি হিন্দুর নমঃশূদ্র-বিষয়ক চিন্তা-চেতনা কি 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র পক্ষে যায়? আর নমঃশূদ্র চিন্তার সাথে যদি সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের 'মালাউন/মুসলমান' দর্শন যোগ হয় তবে বাঙালি সংস্কৃতির অবস্থা কী দাঁড়ায়? আমি তারপরও বলব, বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতি আছে, কিন্তু এই সংস্কৃতিতে অবস্থান করছে যৌথ-অচেতন-সৃষ্ট কিছু ভাষা-দোষ। আমাদের ভাষায় আর কী কী সমস্যা আছে, তা আরো গভীরে গিয়ে দেখা যাক।

বাংলা ভাষায় যে প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা জাত-পাত-কেন্দ্রিক হীনম্মন্যতা, অন্ধবিশ্বাসের বাড়াবাড়ি, ধর্মের নামে সামাজিক শোষণ, বড়লোক বা ধনী লোকদের প্রশংসা, গুরু-পীর-মুর্শিদতন্ত্রের প্রত্নছায়া ইত্যাদির মতো নাস্তিবাচক (negative) উপাদানসমূহকে শনাক্ত করতে পারব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় অবস্থানকারী সব বচন-প্রবচনই নাস্তিবাচক নয়, ভাষায় অবস্থানরত সব ধরনের পজেটিভ/নেগেটিভ উপাদানই ঐতিহাসিকভাবে আমাদের ভাষার সম্পদ, কিন্তু বচন-প্রবচনসহ সব উপাদানই আমাদের 'যৌথ অচেতন'কে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। বাংলা ভাষায় অবস্থানরত বচন-প্রবচনের বিচার-বিশ্লেষণ আমি আমার প্রবন্ধ 'নিজেকে নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ'তে করেছি এবং যে অল্পসংখ্যক বচন-প্রবচন বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, সেগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. হুজ্জতে বাঙ্গাল/হুজুগে বাঙ্গাল
২. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ
৩. গোবরের পদ্মফুল
৪. ভাত নাই যার জাত নাই তার
৫. বড়লোকের আঁস্তাকুড়ও ভালো
৬. শূয়োরের পাল
৭. সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না
৮. অভাবে স্বভাব নষ্ট
৯. টাকার গরম
১০. ইতর বিশেষ
১১. বামুন-শূদ্র তফাত
১২. দেবতা বুঝে নৈবেদ্য
১৩. বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর
১৪. হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না
১৫. জোর যার মুল্লুক তার/মগের মুল্লুক
১৬. চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা
১৭. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
১৮. নানা মুনীর নানা মত

এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, বচন-প্রবচনগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল হঠাৎ, কোনো-এক অবদমিত সৃষ্টিশীল সত্তার মৌখিক ভাষ্য থেকে। অচেতনের যে সত্য বচন-প্রবচন হিসেবে আমাদের ভাষায় অবস্থান নিয়েছে, আবশ্যিকভাবে সেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং আমাদের বর্তমানে এসে এইসব বচন-প্রবচনই আবার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপাদান হয়ে তুলে ধরতে পারে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে।

আমাদের গুরু-পীর, মুর্শিদ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদগণ আসলে একই সমাজভুক্ত শোষকের দল (সবাই খারাপ, আমি তা বলব না, কিন্তু আধুনিক পরিসংখ্যানতত্ত্ব মানলে

'ভালো'-র সংখ্যা অতি-অল্প বা Insignificant)। পীর, মুর্শিদ, গুরু, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ সমাজভুক্ত শোষকের দল ব্যবহার করেন গণ-সম্মোহন বা Mass Hypnotism-এর ভাষা। এই শোষকদের ভাষা, বিবৃতি, বাণী ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করতে পারে, তাদের কথায় প্রাণ দিতেও পারে সাধারণ মানুষ (পাঠক, আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে পথে-ঘাটে রাম, রহিম, যদু, মধু, মতি, শফি ইত্যাদি নামের লাশ পাওয়া গেছে, কিন্তু মিছিলে-ময়দানে শোষক নেতা/গুরুদের লাশ কখনোই পাওয়া যায় না)। ভাষার এই সম্মোহনী গুণকে ব্যবহার করেছে বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ।

বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও উপাদান অনেক সময় 'একক বাঙালি সংস্কৃতি' বিকাশের বিপক্ষেই কাজ করেছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ড. নজরুল ইসলামের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন–

"দেশের রাজনৈতিক নেতা এবং লেখকরা যদি এই চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন তাহলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মঙ্গল হত। কিন্তু তা হয়নি। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র-মনমোহন-গিরিশচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু লেখকরা যেমন তাঁদের সৃষ্টিতে সাহিত্যরসের সঙ্গে মুসলমান-বিদ্বেষের বিষ মেশালেন, মুসলমান লেখকরাও তেমনি তার প্রতিবাদ করে তীব্র প্রত্যাঘাত হানলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স'-এর অধিবেশনে সৈয়দ নওসার আলি চৌধুরী 'বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা' প্রবন্ধে হিন্দুদের লেখায় মুসলমান-বিদ্বেষের একটি চিত্র তুলে ধরেন। রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি লেখকদের যেসব রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তার অধিকাংশই বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। এগুলি পাঠে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ছাত্রদের মনে মুসলমানদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের মনে নিজেদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার ভাব জন্মে।

'নবনূর'-এর সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলি তাঁর 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' (১৩১০) প্রবন্ধে দাবি করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান সমাজের দেহে যেমন অস্ত্রাঘাত করেছেন, তেমনি অনেক কংগ্রেসভক্ত লেখকও করেন। যারা মিটিঙে-মিছিলে মুসলমানকে ভাই বলে সম্বোধন করে তারাও ঘরে ফিরে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করে। এতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্ব হ্রাস পেয়ে শত্রুতার সৃষ্টি হচ্ছে।"

(বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১)

বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব কখনো বঙ্গাল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর কথা বলেছে কি না, এ ব্যাপারেই সন্দেহ পোষণ করেন ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)। আহমদ শরীফ বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে আমরণ চেষ্টা করেছেন এবং এ কারণেই তার বক্তব্য 'বাঙালি সংস্কৃতি'র বিচার-বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি লিখেছেন :

"আমাদের ভাষাও হচ্ছে উত্তর ভারতীয়। আমাদের প্রশাসনও ছিল উত্তর ভারতীয়। কাজেই বাঙালির যে গৌরব এবং গর্ব আমরা করছি, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির গৌরব– তার কোনটাই বাঙালির কীর্তি বা কৃতি নয়। এইটাই হচ্ছে দুঃখের কথা। এই যে শিলালিপির বাহাদুরী আমরা করছি, বলছি যে আমাদের এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত ছিল, আমাদের এখানে মুদ্রা পাওয়া গেছে, আমাদের এখানে সাহিত্যিক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বহু বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ইত্যাদি অনেক কথা বলি, কেন? যারা এই দেশের অধিবাসী– সেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল,

বাগদি– যারা শূদ্র, অস্পৃশ্য– তাদের কথা তো বাংলাদেশের ইতিহাসে লেখা হয়নি, তাদের কোন অস্তিত্বও তো আজও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। বাঙালির ইতিহাস পূর্ণ অবাঙালি বহিরাগতের বিবরণ দিয়ে। বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী যারা এখানে পরাক্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা এখানে ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাদেরই রাজত্বের কথা– তাদেরই বিদ্যাবুদ্ধির কথা– তাদেরই জ্ঞান-গৌরবের কথা, তাদেরই অভাব-প্রতিপত্তির কথা আমরা আমাদের বলে দাবি করে গর্বে বুক স্ফীত করছি।"
(আহমদ শরীফ, বাঙলা ও বাঙলাত্ব, কোলকাতা-১৯৯২)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে উপরে যা উপস্থাপন করা হল তা যদি যুক্তিসহ পাঠক বিশ্লেষণ করেন তবে 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি' প্রশ্নের সম্মুখীন হবে; শ্রেণীস্বার্থ, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতি ইত্যাদিই প্রাধান্য পাবে বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির মুখ্য উপাদান হিসেবে। কিন্তু তারপরও আমি বলব, বঙ্গাল বা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি বেশ প্রবলভাবেই আমাদের সমাজে অবস্থান করছে, কিন্তু এই সংস্কৃতির বিরোধীপক্ষ হিসেবে অবস্থান করছে অবদমিত যৌথ অচেতন-সৃষ্ট কিছু বিরোধ ও অস্তিত্ব-সংকট। এই অস্তিত্বের সংকট এবং অবদমিত অচেতন গ্রাহ্য করেই হয়তো-বা তাই আমাদের এক বস্তুবাদী কবিও লিখে ফেলেন– 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে' কিংবা প্রতিদিন সকালে দুর্নীতিমুক্ত থাকার বাসনা নিয়ে আরেক কবি বলেন, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।'

প্রকৃতি ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের মাটি উর্বর ছিল, জলবায়ু ছিল কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত এবং নদী-খাল-বিলে ছিল প্রচুর মাছ। সবকিছু মিলিয়ে অল্পস্বল্প কষ্ট করেই জীবনধারণ করা যেত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে। কিন্তু তারপরও বহিরাগত শাসকগোষ্ঠীর কাছে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জলবায়ু খুব একটা সুখকর ছিল না। বন্যা, খরা, কালবৈশাখী, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন-জঙ্গল, মশা-মাছি, সাপ, বাঘ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের বদনামই ছিল বেশি। আমরা যদি বিভিন্ন পুরাণের ব্যাখ্যা পড়ি, তবে দেখতে পাব যে আর্যভাষীরা আমাদের কালো চামড়ার পূর্বপুরুষদের এবং বঙ্গদেশকে ঘৃণার চোখেই দেখেছে।

প্রাচীন বঙ্গদেশের মাটি কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত ছিল সত্য; কিন্তু বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে এই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিত প্রায়ই এবং এমন দুর্যোগকে কেন্দ্র করেই বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজে সবসময়ই অবস্থান করত এক ধরনের অস্তিত্বের

সংকট। অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করেই বঙ্গাল জনগোষ্ঠীর মাঝে মনস্তাত্ত্বিক স্বার্থপরতা এবং পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ পেয়েছিল, এমন ধারণা করা বোধহয় অযৌক্তিক নয়। বঙ্গাল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করে ওই সময় আবার আড়তদার, মজুতদার ও মহাজন শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। অধিক মুনাফার লোভে আড়তদার, মজুতদার ও মহাজনবৃন্দ স্থানীয় শাসকদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মানুষদের শোষণ করতে থাকে। একদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক অস্তিত্বের সংকট এবং তার সঙ্গে যোগ হওয়া সামাজিক শোষণ বঙ্গাল বা বাঙ্গালিদের অবদমনকে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই অনেক বাড়িয়ে দেয়। একটি জাতির সামাজিক বাস্তবতা যখন 'বাঁচা-মরার লড়াই' পর্যায়ে চলে যায়, তখন সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ কোনো অবস্থাতেই মুখ্য হতে পারে না এবং এমন একটা পরিস্থিতিতেই অবদমিত বঙ্গাল/বাঙালি সত্তায় যৌথ-অচেতনের উপাদান হয়ে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতি ইত্যাদি অনেক বেড়ে যায়। জাত-পাত ও ধর্মকেন্দ্রিক শোষণ বঙ্গাল বা বাঙালিদের অবস্থা 'খারাপ থেকে আরও খারাপের' দিকেই নিয়ে গিয়েছিল এবং এমন অবস্থায় 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র বাস্তবতাও হয়ে গিয়েছিল স্বপ্নের উপাদান।

'মাছ-ভাতের বাঙালি সংস্কৃতি', 'ধুতি-শাড়ির বাঙালি সংস্কৃতি' কিংবা 'দোচালা/চারচালা বসতবাড়ির বাঙালি সংস্কৃতি' ছিল প্রকৃতিপ্রদত্ত সাংস্কৃতিক উপাদান। বাংলাদেশের নদী, খাল, বিল, পুকুর ও বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর মাছ উৎপন্ন হত, যা ছিল বঙ্গাল/বাঙালির একমাত্র প্রোটিন-উৎস (পরবর্তীকালে ওলন্দাজরা বঙ্গদেশে ডালের চাষ প্রবর্তন করে) এবং এর ফলে 'মাছে-ভাতে' বাঙালি হওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। গৃহনির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বাংলাদেশে পাওয়া যেত মাটি, বাঁশ, বেত, খড় ও শন। প্রাকৃতিক কারণেই তাই বঙ্গাল/বাঙালির বসতবাটি হয়েছে মাটি, বাঁশ ও শনের তৈরি এবং কালবৈশাখীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘরের চালকে করা হয়েছে দোচালা কিংবা চারচালা (বাতাসের প্রবাহ যাতে কৌণিক তল বেয়ে সহজেই প্রবাহিত হতে পারে)। প্রকৃতি বাধ্যতামূলকভাবে মানুষকে দিয়ে যা করায় তা সংস্কৃতির বিষয় কি না তা নিয়েই সন্দেহ আছে এবং এ কারণে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' তত্ত্ব বাঙালি সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য– এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে এ কথাও সত্য যে বাংলাদেশের প্রকৃতি দেশের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি মাঝেমধ্যে দুর্দশার কারণ হলেও এই দেশের জনগণকে দিয়েছেও প্রচুর। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর স্বপ্নভরা আগামীকে দেখিয়ে এই দেশের মানুষের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে প্রকৃতি। অবদমিত জনগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক আনন্দ ও বিরহের প্রকাশ হয়েছে লোকসঙ্গীতে, যাত্রায়, উৎসবে ও পার্বণে।

বাংলাদেশের প্রকৃতি এখনও ইতিহাসের নিয়ম মেনেই ক্রিয়াশীল। এখনও আমাদের দেশের মানুষ ভুগছে অস্তিত্বের সংকটে; খরা, বন্যা, কিংবা ঘূর্ণিঝড়ে ফসল নষ্ট হলে সুযোগ নিচ্ছে মজুতদার, আড়তদার আর মহাজনবৃন্দ। গ্রামের চাষি আর ভোক্তার মাঝে অবস্থান করছে বিভিন্ন শ্রেণীর দালাল ও মস্তান, আর দালাল-মস্তানদের 'গডফাদার' হিসেবে দেহের চর্বি বাড়াচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত আমলা ও রাজনীতিবিদরা। এদিকে বাংলাদেশের শতকরা ৭০ জন মানুষ এখন আর 'মাছে-ভাতে বাঙালি' নেই, তারা 'ডালে-ভাতে বাঙালি' আছে কি না তাতেও সন্দেহ আছে; তবে দেশের দুর্নীতিবাজদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ভালোই হয়েছে, তারা 'পোলাও-কোর্মায় বাঙালি' কথাটা চালু করা যায় কি না ভাবছেন।

বাংলাদেশের (বঙ্গদেশের) প্রাচীন জনগোষ্ঠী 'বঙ্গাল' নামে পরিচিত ছিল এবং তাদের ছিল অস্তিত্বের সংকটহীন এক ধরনের কৌম সমাজ। প্রাচীন এই সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশ হয়েছিল কৌম-ভিত্তিক লোকধর্মের প্রভাবে। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে দেখা দেয় জাত-পাত-কেন্দ্রিক শ্রেণীবিভাজন এবং এই জাত-পাত-কেন্দ্রিক শ্রেণীবিভাজনই সমাজে নিয়ে আসে অস্তিত্বের সংকট। সমাজে বর্ণভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার বিভিন্ন মাত্রা অবস্থান করার কারণে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকাঠামো (Paradigm) বিবর্তিত হতে থাকে শ্রেণীসংগ্রামভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে। সমাজে যেহেতু অস্তিত্বের-সংকট-কেন্দ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন অবস্থান করছিল, সেহেতু ব্রাহ্মণ্যবাদ-পরবর্তী বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজ কখনোই আর কোনো-এক একক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো নিয়ে এগুতে পারেনি। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সংকট ও বিভাজন নিয়ে, শুধুমাত্র 'মাছে-ভাতে বাঙালি' কিংবা 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র মতো ভাষাভিত্তিক কিছু বুলি নিয়েই এগুতে থাকে আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজ।

ব্রাহ্মণ্যবাদ পরবর্তী মোগল, পাঠান এবং ইংরেজ যুগ বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলিম সমাজ বিভক্ত হয়েছিল আশরাফ-আফতাব শ্রেণীতে; চিশ্‌তিয়া-সরোওয়ার্দিয়া-নক্‌শবন্দিয়া ইত্যাদি নামের তরিকাও বিভক্ত করেছিল মুসলমান সমাজকে বিভিন্ন পীর-মুর্শিদের বাণী ও চিন্তাকে কেন্দ্র করে। হিন্দু-মুসলমান যুগ্ম-বৈপরীত্য ও বিনির্মিত (deconstruction) হয়ে যায় 'মুচলমান-বাঙালি', 'হিন্দু-যবন', 'মুসলমান-মালাউন' কিংবা 'মুসলমান-কাফের'। সমাজের এই ভাঙনের মুখে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই কোনো একক সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ বঙাল বা বাঙালি সমাজে হয়নি, বরং এই মনস্তাত্ত্বিক ভাঙনকে কেন্দ্র করে সমাজের মানুষ হয়ে ওঠে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং পরশ্রীকাতর। ইংরেজ শাসন Divide and Rule নীতি প্রয়োগ করার ফলে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত আরও বেড়ে যায় এবং ইংরেজদের রাজনীতি বাংলাদেশে সৃষ্টি করে 'জমিদার-প্রজা', 'আড়তদার-কৃষক', 'বাবু-রায়ত' ইত্যাদির মতো শোষণের যুগ্ম-বৈপরীত্য।

ইংরেজ শাসন-আমলে বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন বাঙালি সুবিধাবাদী সমাজ (মুসলমান সমাজ বাঙালি হিসেবে গণ্য হত না এবং এ কারণে রেনেসাঁস আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ করা সম্ভবও ছিল না)। বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতাদের চেতনা-চৈতন্য কেমন ছিল, তা জানার জন্য প্রবীর ঘোষ রচিত 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ' থেকে কিছু অংশ তুলে দেয়া যাক :

"রেনেসাঁসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেসাঁস যুগের পুরোধা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, ডিরোজিও প্রমুখ ঊনবিংশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতাদের যে মূল্যায়ন হয়ে আসছে তার মধ্যে যুক্তিবিচার বাস্তবিকই স্থান পায়নি। ব্যক্তিপূজার ফলে এঁরা অনেকেই আজ এমনই এক কিংবদন্তি জগতের

মহানায়কের রূপ পেয়েছেন যে এঁদের সীমাবদ্ধতা, নেতিবাচক দিক, ভ্রান্ত-চিন্তা, এমনকি দেশের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মতো দিকগুলোর প্রতিও বর্তমানের মূল্যায়নকারীরা কিছু বলতে ভয় পান। ফলে জনসমর্থন-সচেতন এইসব সমালোচকের কৃপায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এসব নায়ক চরিত্রগুলোর মূল্যায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রেনেসাঁস-যুগের নায়কেরা কেউই তাঁদের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসে বাস্তবিকই 'মহান' হয়ে উঠতে পারেননি। বাস্তবপক্ষে তাঁদের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই তাঁদের অসাধারণ গুণাবলি ব্যাপক নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পথে কোনও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাঁদের এই রেনেসাঁস নামক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল স্পষ্টতই সংখ্যালঘু কিছু মানুষের জন্য তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ এক খণ্ডিত ও আধুনিকতার প্রহসনে আবদ্ধ আন্দোলন।"
(সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা)

বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে পুস্কর দাশগুপ্তের মূল্যায়নও উল্লেখযোগ্য, তিনি লিখেন :
"এদেশের এই ভণ্ডামির জাতীয় চরিত্র সনাতন। সন্ন্যাসীবেশী রাবণ, ধনা-মনা কি ভাঁড়ু দত্তের অভাব এদেশে কখনো ছিল না, অভাব ছিল না 'বিড়ালতপস্বী', 'বকধার্মিক' বা 'তুলসী বনের বাঘ'-এর। তারপর জীবন ও জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক ইংরেজি শিক্ষা দ্বিধা-বিভক্ত স্কিজোফ্রেনিক জীবনচর্যার মাধ্যমে এই ভণ্ডামিকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক স্বীকৃতি দিল। উনিশ শতকের মধুসূদন, বিদ্যাসাগরের মতো দুয়েকজনের বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাঙলার তথাকথিত নবজাগরণের অনেকের জীবনে এই দ্বিচারিতা ভণ্ডামির আখ্যা পেতে পারে। বাঙালির নবজাগরণের, 'আধুনিক' ভারতের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের জীবন এর উদাহরণ। একদিকে কালেক্টর ডিগবির সহকারী হিসেবে উৎকোচ গ্রহণ এবং বিবিধ কূট উপায়ে বিশাল সম্পত্তি ও অর্থ উপার্জন, অন্যদিকে ধর্ম-সংস্কার ও বিপ্লবের সমর্থন এই দ্বৈত অস্তিত্বের নিদর্শন।
ভারতীয় সমাজ এই ভণ্ডামিকে প্রায়শ গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে এই ভণ্ডামি প্রত্যাশা করে। সাহিত্য-স্রষ্টা, যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যাত হন একদিকে 'ঋষি' অন্যদিকে 'সাহিত্য-সম্রাট' বলে। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলা হাস্যকর ভণ্ডামি এবং একজন আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টার প্রতি মোটেই সম্মানজনক নয় একথা কারও মনে হয়নি। তাছাড়া 'সাহিত্য-সম্রাট'– সেক্সপিয়ার, মিল্টন, গ্যাটে, ডিকেন্স, স্তাঁদাল এঁদের কারো নামের আগে কি এ-জাতীয় বিশেষণ কল্পনা করা যায়? এই বিশেষণ যে কতটা হাস্যকর তা প্রমাণ হয় যখন শোনা যায় যে 'সাহিত্য-সম্রাট'-এর অনুকরণে তৈরি পরবর্তীকালের বিশেষণগুলি নাট্য-সম্রাট, নাট্য-সম্রাজ্ঞী, যাত্রা-সম্রাট, জ্যোতিষ-সম্রাট, জাদু-সম্রাট, বাউল-সম্রাট ইত্যাদি।
ধনী জমিদার, ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের আগে বিশেষণ বসে 'মহর্ষি', সাংবাদিক ও খবরের কাগজের মালিক শিশির কুমার ঘোষের নামের আগে 'মহাত্মা'। জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনায় বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অরবিন্দ ঘোষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে মানিকতলার বোমার মামলায় রাজদ্রোহের অভিযোগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে তিনি বন্দি হন। এই মামলার ধৃত প্রায় সবারই

কয়েক বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। এক ধরনের মানসিক সংকটে বাস্তব থেকে পলায়নের মানসিকতায় কারাগারে অরবিন্দের মরমিয়া উপলব্ধি হয়। তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের বাইরে ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরিতে গিয়ে সাধনাশ্রম খোলেন। লোকজন তাঁর নামের আগেও 'ঋষি' বসিয়ে দেয়।"

(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৬)

বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের মাঝে রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমরা যদি উল্লিখিত কবি ও সাহিত্যিকদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাই, তবে আমরা এক ধরনের মুখোশপরা অস্তিত্বকেই আবিষ্কার করতে পারব। রামমোহন রায়কে দেখব ঘুষখোর আমলা হিসেবে, যিনি নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংরেজ-বন্দনা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করব এক সাম্প্রদায়িক সত্তা হিসেবে, যিনি মুখোশ চাপিয়ে নিজস্ব আসল ও নকলকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এক জনগণ-বিচ্ছিন্ন সত্তার, যার ফলে তার সৃষ্টি ও সাহিত্যকর্মে সাধারণ মানুষের কথা খুব একটা নেই। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনায় বেদ, উপনিষদ ও পশ্চিমের দর্শনই প্রাধান্য পেত এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে তিনি হয়তো-বা ছিলেন প্রচণ্ডভাবে গুরুতন্ত্রে বিশ্বাসী। লালন ফকিরের সাথে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল শিলাইদহে এবং লালনের মাধ্যমেই লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, এমন চিন্তা আমরা করতে পারি। কিন্তু আমরা যখন জানতে পারি যে লালন রচিত দুইটি গানের খাতা রবীন্দ্রনাথ পড়ার জন্য নিয়ে আর কখনো ফেরত দেননি (সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কলিকাতা ২০০৭), তখন ব্যাপারটিকে রবীন্দ্র-চরিত্রের সাথে মেলাতে কষ্ট হয়। যাহোক, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে প্রবীর ঘোষ ও পুস্কর দাশগুপ্তের কিছু মূল্যায়ন পাঠকের অবগতির জন্য তুলে দেয়া হল।

ক.

"রামমোহন ইংরেজ শাসকদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে দেশীয় উচ্চবর্ণদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ বার বার বারিধারার মতোই বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর কাজকর্মে যে চিন্তাধারা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হল এই–

(১) ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নাও।

(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বরের করুণার মতোই এসে পড়েছে।

(৩) ইংরেজদের সাম্রাজ্যরক্ষায় সব রকমে সাহায্য কর।

(৪) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের ঘৃণা কর। ওই বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে ইংরেজদের সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে এস।

(৫) সভা-সমিতি গড়ে সেগুলোর মাধ্যমে ইংরেজদের জয়গান কর। ইংরেজদের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ কর।

(৬) সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সুফল বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত কর।

(৭) ইংরেজদের কাঁচামাল রপ্তানি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে তৈরি জিনিস আমদানির ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন কর।"
(সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা ১৯৯৩)

খ.

"বাঙালি/ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর দ্বিধাবিভক্ত জীবনচর্যা, দ্বৈত ব্যক্তিত্বের প্রতীকী নিদর্শন হিসেবে বাঙলা ভাষার লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি বিশেষ অর্থবহ। কাঁঠালপাড়ার নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণবাড়ির ছেলে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঘরে' ধুতি ও ফতুয়া পরতেন, অথচ চোগা-চাপকান পরা শামলা মাথায় প্রথম বাঙালি গ্র্যাজুয়েট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 'বাইরের' বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি বাদ দিয়ে তাঁর আর কোনো ছবি আমাদের চোখে পড়ে না।"
(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৫)

গ.

"কবি রবীন্দ্রনাথ ভূষিত হয়েছেন 'বিশ্বকবি' 'কবিগুরু' ও 'গুরুদেব' পদবিতে। বিশ্ব-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় রোমান্টিক কবিদের একজন। এছাড়া উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান– সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে অনন্য সমৃদ্ধি দান করেছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের প্রথা ও প্রত্যাশার নিয়ন্ত্রণে এই শিল্পস্রষ্টা প্রাত্যহিক জীবনে আলখাল্লা পরে আর তাবৎ ব্যাপারে বাণী দিয়ে সারাজীবন গুরুদেব-এর ভূমিকায় অভিনয় করে গেলেন। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজে তাঁর স্থান উনিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যে ভিক্তর য়ুগোর স্থানের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু ভিক্তর য়ুগো কবি, সাহিত্য-স্রষ্টা– 'গুরু' নন, 'ঋষি' নন, 'সন্ত' নন। ভণ্ডামির পীঠস্থান এই দেশ এই সমাজের নিয়ন্ত্রণে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর স্বাভাবিক মানবিক দুর্বলতা, স্ববিরোধ, আবেগ-অনুভূতি সব আলখাল্লার আড়ালে গোপন রেখে বাল্মিকী, কালিদাসের মিথিকেল জীবনযাপন করতে বাধ্য হলেন।"
(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৫)

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো পাঠ শেষে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে একটি সমাজের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সামাজিক লোকজনের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে। শুধুমাত্র ভাষা, খাদ্যাভ্যাস কিংবা নাচ-গান দিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোঝানো যায় না, কারণ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ লুকানো থাকে মনের গহীন গভীরে। অবদমিত, বিভাজিত এবং অস্তিত্বের সংকট নিয়ে বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে ঠিকই এবং ব্রিটিশ শাসন আমলে সৃষ্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুল পেরিয়ে বঙ্গালরা পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতিতে বন্দি পশ্চিমবঙ্গ।

পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে বিবেচিত হলেও, মূলত এটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা যে খুব একটা সঠিক ছিল না, তা বুঝতে বঙ্গালদের খুব একটা সময় লাগেনি। তবে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বঙ্গাল বা বাঙালিদের মনস্তাত্ত্বিক সংস্কৃতিবোধ ছিল অসম্পূর্ণ ও দ্বিধাগ্রস্ত এবং এ কারণে তাদের ইতিহাসকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়ের সংকটও ছিল প্রকট। পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গাল বা বাঙালিরা

নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রায়ই ভাবত,– 'আমরা কি মুসলমান? নাকি মুসলমান বাঙালি? নাকি শুধুই বাঙালি?' । বঙ্গাল বা বাঙালিদের যে আত্মপরিচয়ের সংকট ছিল, তাকে মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক সংকট হিসেবেই বিবেচনা করা যায় । আর এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট বাংলাদেশের বঙ্গালদের মনে জন্ম দিয়েছিল এক ধরনের অপসংস্কৃতির ।

সংস্কৃতির সাথে ধর্মকে অহেতুক টেনে এনে বঙ্গালরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বর্জন করতে চেয়েছিল, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার লাইন "নব নবীনের গাহিয়া গান/সজীব করিব মহাশ্মশান"-এর 'মহাশ্মশান' শব্দটির জায়গায় যোগ করা হয়েছিল 'গোরস্তান' এবং সাংস্কৃতিক সংকট আরও প্রকট করার জন্য 'তাহজীব' ও 'তমুদ্দুন' আমদানি করার চেষ্টা করা হয়েছিল অযৌক্তিকভাবে । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সংকটাপন্ন সংস্কৃতিতে 'তাহজীব' ও 'তমুদ্দুন' প্রতিষ্ঠা পায়নি, তবে মনস্তত্ত্ব-কেন্দ্রিক কিছু সাংস্কৃতিক ভুলকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে । বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন পুরুলিয়ার (পশ্চিমবঙ্গের) কাজী নজরুল ইসলাম (শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে), অথচ বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হিসেবে বাংলাদেশের অনেক বেশি আপনজন, কারণ তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল শিলাইদহে, শাহজাদপুরে কিংবা পদ্মা আর গড়াই নদীর বুকে বোটে ভ্রমণরত অবস্থায় । আমরা, বঙ্গালরা, এক অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের আওতায় থেকে আমাদের সংস্কৃতির সত্যকে আবিষ্কার করতে পারিনি, বরং অবদমিত মনস্তত্ত্বের কারণেই আমরা সমাজে অবস্থান করছি দুর্নীতিগ্রস্ত, পরশ্রীকাতর আর স্বার্থপর মন নিয়ে । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে সামাজিক অবক্ষয় এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছিল যখন প্রাদেশিক পরিষদের মাননীয় স্পিকারকেও রাজনীতিবিদ নামধারী কিছু মস্তানের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।

১৯৭১ সালে এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় লাল-সবুজ পতাকার স্বাধীন বাংলাদেশকে । বাংলাদেশকে স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছিল আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য নেতৃত্বের কারণে । বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও আমাদের অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং এর ফলে দেশ স্বাধীন হবার পর পরই বেশ কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধা, মস্তান, আমলা এবং তাদের সহযোগী জনসাধারণ লুটপাটতন্ত্র কায়েম করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অসাধারণ নেতা ছিলেন; কিন্তু দেশ পরিচালনায় তিনি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেননি । অবদমিত সাংস্কৃতিক সত্তার অধিকারী হয়ে তিনিও স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে যেতে পারেননি, যদিও তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছিলেন– 'চাটার দল সব খেয়ে ফেলল... । আমার কম্বলটা কই?'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন । এবং এ দুষ্কর্মে সহযোগী ছিল আওয়ামী লীগেরই কতক সুবিধাবাদী নেতা আর সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক প্রাক্তন ও কর্মরত সদস্য । বঙ্গবন্ধু শহীদ হবার পর তার দলের অন্যতম প্রধান নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু সদস্য নতুন সরকার গঠন করেছিলেন, কিন্তু তাদের এই অপকর্ম খুব বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারেননি । তবে ক্ষমতায় অবস্থান করে খোন্দকার সাহেব বঙ্গাল ও বাঙালিদের উপহার (!) দেন সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' নামে এক তত্ত্ব, যার ফলে আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের প্রাচীনতম (!)

উপাদান হয়ে ওঠে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার ঘটনা, আমরা ভুলে যাই আমাদের বঙ্গাল সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক প্রাচীন ইতিহাসকে। 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে' যেহেতু সাম্প্রদায়িক উপাদান ছিল, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের 'জয় বাংলা' স্লোগানটিকেও বদলে বিদেশি ভাষাযুক্ত করে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' করা হয়। খোন্দকার মোশতাক আহমদ খুব বেশি দিন বাংলাদেশের মসনদের দখল রাখতে পারেননি, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা খালেদ মোশাররফের এক ব্যর্থ ক্যুয়ের পরিণতিতে, সিপাহী-জনতার বিদ্রোহের মাধ্যমে, মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে নেন (ব্যাপারটিকে 'দখল' বলা যায় এ কারণে যে, ১৯৭১-পরবর্তী সব রাজনৈতিক ঘটনাই ছিল সুবিধাবাদী চরিত্রের। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লাল বাহিনী, মুজিব বাহিনী ইত্যাদির সংগঠন, খোন্দকার মোশতাকের মসনদ দখল, জিয়াউর রহমানের আগমন ইত্যাদি কোনোটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ ছিল না)। জেনারেল জিয়াউর রহমান 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-এর তত্ত্ব গ্রহণ করে, 'money is no problem'-তত্ত্ব যোগ করে সরকার চালাতে সচেষ্ট হন। ব্যক্তিগত জীবনে জিয়াউর রহমান খুবই সৎ থাকলেও, তার দলে লোকজনের দুর্নীতিকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেন। ১৯৮১ সালে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জিয়াউর রহমান নিহত হন চট্টগ্রামে। তার মৃত্যুর পর জিয়াউর রহমান-সৃষ্ট বিএনপি অল্প কিছুদিন ক্ষমতায় ছিল জাসটিস সাত্তারের নেতৃত্বে। তারপর এক ক্যু'র মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী নেতাদের সাথে নিয়ে একসময় 'বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি' নামে একটি দলকে সংগঠিত করেন এরশাদ। হু মু এরশাদ ও তার দলের বেশিরভাগ লোকই ছিল সুবিধাবাদী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত এবং এর ফলে ১৯৯০ সালে এক গণআন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। এরশাদ সরকারের পতনের পর বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে সরকার গঠন করেছে; কিন্তু রাজনীতিবিদ ও তাদের চেলা-চামুণ্ডার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতার কারণে বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ সুষ্ঠুভাবে দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়। 'হজুগে বাঙাল' কিংবা 'হুজ্জতে বাঙাল' জনগণ সব ধরনের যুক্তি ও বাস্তবতা অগ্রাহ্য করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিতে থাকে, দেশের জনগোষ্ঠী অযথাই ভাগ হয়ে যায় 'আওয়ামী পন্থী' ও 'বিএনপি পন্থী' হিসেবে। এ সুযোগে সাম্প্রদায়িক শক্তি জামায়াত তাদের কার্যক্রম বেশ ভালোভাবেই চালাতে সমর্থ হয়।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সামরিক বাহিনীর সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এই সরকার ক্ষমতায় এসেই বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও অন্যান্য দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা এবং তাদের সহযোগী আমলা, ব্যবসায়ী, মস্তান ও শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর বঙ্গাল জনগণ জানতে পারে তাদের দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণ। জনগণের সম্পদ হাজার হাজার কোটি টাকা কীভাবে যে লোপাট করা হয়েছে, তা জানতে পারে অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের অধিকারী বঙ্গাল জনগণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায় (কিন্তু এ কথাও সত্য যে অস্তিত্বের সংকট নিয়ে বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণই বিভিন্ন মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত)। দুর্নীতির অভিযোগ থেকে নিজেদের বাঁচাতে অনেক চিহ্নিত নেতা বিএনপি আর আওয়ামী লীগ ভেঙে নতুন সংগঠন তৈরি করতে সচেষ্ট হন, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের টক-শোতে 'পবিত্র আত্মা'

হিসেবে উপস্থিত হন অনেক চেনা-অচেনা দুর্নীতিগ্রস্ত মহাপুরুষ (!)। সুশীল সমাজের মুখোশ এঁটে অনেক সুবিধাবাদী লোকজনও খুব ঘন ঘন বিবৃতি দিতে থাকে তাদের পাপকে লুকিয়ে রাখতে।

যে ঘটনাসমূহ ইতোমধ্যে বর্ণনা করা হল, তার মাঝেই লুকিয়ে আছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংস্কৃতির উপাদান। জাতীয় কিংবা ব্যক্তিগত সংস্কৃতি যে শুধুমাত্র নাচ-গান, খাদ্যাভ্যাস, ধর্ম, পূজা-পার্বণ, ভাষা ইত্যাদি নয় তা বুঝা যাবে ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলেই। হাজার বছরের অস্তিত্বের সংকট এবং অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের কারণেই বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে দুর্নীতি করার সমস্ত উপাদান। এ প্রসঙ্গটি আরও একটু খোলাসা করার জন্য সংস্কৃতি ও অর্থনীতি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হবে।

অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

সুন্দর জীবনযাপন করে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন এমন এক ভারসাম্যের অর্থনীতি, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার বাঁচার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পাবে। যখন মানুষ এমন সুবিধা পায় না, ঠিক তখনই সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের সংকট। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'– এই প্রবচনটি গ্রাহ্য করে একজন হতদরিদ্র মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদেই হয়ে উঠবে দুর্নীতিগ্রস্ত। আমাদের দেশের ইতিহাসে যে জাত-পাত কেন্দ্রিক শ্রেণী-বৈষম্য ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই অস্তিত্বের সংকট শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করেই জন্ম নেয় সুবিধাবাদী শ্রেণী এবং এই সুবিধাবাদী শ্রেণীর প্রবহমান বর্তমানই হল আমাদের দেশের নেতা, নেত্রী, আমলা, ব্যবসায়ী, মস্তান, শ্রেণীসংগ্রামরত মানুষ এবং সমগ্র জনসাধারণ। আসলে আমাদের যৌথ মনস্তত্ত্বে অবস্থান করছে এমন এক অপসংস্কৃতির উপাদান, যার ফলে আমরা আর আমাদের সঠিক মানবিক উপাদানসমূহকে উদ্ধার করতে পারছি না।

একজন হতদরিদ্র মানুষ দুর্নীতি করে কোনো-একসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আরও সুবিধা নিয়ে, দুর্নীতি করে হয়ে ওঠে উচ্চ-বিত্তের মানুষ। একজন মানুষ যখন 'টাকার কুমির' হয়, তখনও তার 'অস্তিত্বের সংকট' কমে না, বরং বেড়ে যায়। দুর্নীতি করে জমানো সম্পদ রক্ষা করাকে কেন্দ্র করেই তার 'অস্তিত্বের সংকট' তৈরি হয় এবং এমন অবস্থায় সম্পদ রক্ষার কারণেই সে মূল ক্ষমতা-কাঠামো বা Power Structure-এর অংশ হতে চায় (Power Structure সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠক মিশেল ফুকোর দর্শন পড়ে দেখতে পারেন)। আমাদের দেশেও যারা 'টাকার কুমির' হয়েছেন দুর্নীতি করে, তারা ক্ষমতা-কাঠামোর কাছাকাছি থাকার জন্য সংসদ সদস্য হয়েছেন নমিনেশন ক্রয়

করে, হয়েছেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী কিংবা রাজনৈতিক দলের মহা-মস্তান। সম্পদ রক্ষার জন্য তারা লালন-পালন করেছেন বন্দুক-পিস্তলওয়ালা মস্তান বাহিনী। অনেক সময় ক্ষমতা-কাঠামোর কাছাকাছি থাকার জন্য তারা প্রকাশ করেছেন সংবাদপত্র কিংবা মালিক হয়েছেন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের। জানুয়ারি ১১, ২০০৭-পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করলে পাঠক উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাবেন।

অর্থনীতি যে মানুষের মনস্তত্ত্ব সংগঠিত করে এবং 'পাওয়া-না-পাওয়া'-কে কেন্দ্র করে তৈরি হয় 'অবদমন', এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই অবদমন যখন 'যৌথ মনস্তত্ত্বের' অংশ হয়ে যায় সংস্কৃতির উপাদান, তখনই সমাজ সংগঠন ভেঙে পড়ে। আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির বেলায় অস্তিত্বের সংকট আর অবদমন-ঘটিত পতন ঘটেছে এবং এমন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপাদান হল দীর্ঘকাল ধরে সমাজকে Social Psychotherapy দেয়া। ব্যাপারটি কীভাবে করা যাবে, তা নির্ধারণ করবেন আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। তবে লেখকের মতে, আমাদের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, অন্যান্য মাস-মিডিয়া এবং সত্যিকার সুশীল সমাজ এ ব্যাপারে কাজ করতে পারেন এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য যথাযথ পাঠ-কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুচিন্তন

সব শেষে, উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ নিতে পারি।

১. সংস্কৃতি শুধুমাত্র শিল্প, সাহিত্য, নাচ-গান, জীবনধারণ প্রণালী, ধর্ম, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি নয়, সংস্কৃতির মূলে অবস্থান করে সামাজিক মানুষের যৌথ মনস্তত্ত্ব।

২. বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিতে অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের অনেক উপাদান ঢুকে গেছে জাত-পাত-কেন্দ্রিক শোষণের ফলে, অর্থনৈতিক ভারসাম্যতা নষ্ট হওয়ার কারণে এবং ধর্মকেন্দ্রিক বিভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে।

৩. আমরা যাদের মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য করি, আমরা যাদের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ভাবি, তাদের মনস্তত্ত্ব ও কার্যক্রমও বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আমাদের জাতীয় চরিত্র বুঝে নিজেদের শুধরাতে হবে।

৪. আমাদের সংস্কৃতি থেকে অপসংস্কৃতির উপাদানসমূহ দূর করার জন্য প্রয়োজন Social Psychotherapy-র। এ ব্যাপারে দেশের মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করা যেতে

পারে, যাদের কাজ হবে যৌথ মনস্তত্ত্বের অবদমন দূর করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম প্রণয়ন করা।

৫. আমাদের দেশের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও ও অন্যান্য মাস-মিডিয়া দীর্ঘমেয়াদি প্রচারের মাধ্যমে Social Psychotherapy কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে।

সংযোজন

'বাঙালি' বা 'বাংলাদেশী' শব্দযুগল দিয়ে আমাদের জাতিসত্তাকে প্রকাশ না-করে কেন 'বঙ্গাল' শব্দটি ব্যবহার করা হল, এ নিয়ে অনেক পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন। প্রবন্ধের লেখক হিসেবে ব্যাপারটি যুক্তি এবং ইতিহাসের সত্য-বচনসহ উপস্থাপন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ছিল সুপ্ত 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' প্রত্ন-ছায়া, যা ১৯৭৫ সালের পর ঐতিহাসিক মিথ্যা হিসেবে হঠাৎ উপস্থিত হয়। এ তত্ত্বের মূলে রয়েছে এক সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা, যা কখনোই বাঙালি বা বঙ্গালদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সত্যকে উপস্থাপন করে না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের ইতিহাসকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত করলেও, আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে।

'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-ও 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' মতো সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ পায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, যখন বঙ্গদেশে 'হিন্দু-মেলা' কিংবা 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস' নামে কিছু সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের বিকাশ লাভ করেছিল। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বঙ্গীয় জনসাধারণকে 'বাঙালি' ও 'মুচলমান' নামক দুটি সাম্প্রদায়িক সত্তায় বিভক্ত করে ফেলেছিল, যার ফলে 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতির' সাথে যুক্ত হয়েছিল শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসাধারণ।

যে কোনো জাতির সঠিক আত্মপরিচয়, নৃতাত্ত্বিক উৎসমূল এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে আবশ্যিকভাবে শিকড়-সন্ধানী হতে হয়। আমরা যদি জাতি হিসেবে আমাদের উৎস বা মূল বিচারে আনি, তবে ১৯৭৫ সালের সাম্প্রদায়িক চিন্তার ফসল 'বাংলাদেশী জাতি'র অন্তর্ভুক্ত আমরা নই, কিংবা অষ্টাদশ শতকের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' আমাদের সঠিক আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেয় না। বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশের হাজার বছরের ইতিহাস বিবেচনায় আনলে আমরা দেখতে পাব যে প্রাচীন বঙ্গদেশের সমতট, বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, হরিকেল, গঙারিডী, তাম্রলিপ্তি, সূক্ষ্ম, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র নামের আদিম জনপদ সমন্বয়ে সংগঠিত বৃহৎ-বঙ্গের বঙ্গাল সম্প্রদায় বা জাতি-ই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ এবং

এ সত্যকে মেনে নিয়ে এবং নৃতাত্ত্বিক ও জেনেটিক বিশ্লেষণের যৌক্তিক উপাদানসমূহ গ্রাহ্য করে, বঙ্গাল জাতির উত্তরসূরি হিসেবে আমরা নিজেদেরকে 'বঙ্গাল জাতি' হিসেবেই বিবেচনা করব। কোনো জাতির ইতিহাস তিরিশ, পঁয়ত্রিশ কিংবা দুইশত বছরের পুরনো হয় না, একটি জাতির সঠিক উৎসমূলের ইতিহাস হয় হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশে। আমরা যদি বঙ্গাল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হই, তবে আমাদের চিন্তা-চেতনাও হবে অসাম্প্রদায়িক আর আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে নিয়ে যেতে পারব হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসে।

আমার এই জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব হয়তো-বা বঙ্গীয়-গৌর, গাঢ়-শ্যাম বা উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণের তথাকথিত ব্রাহ্মণ বা আর্যদের (!?) পছন্দ হবে না; কিংবা যারা নিজেদের মোগল, পাঠান কিংবা আরব বংশের উত্তরসূরি মনে করেন, তারাও আমার এ তত্ত্ব গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু আমি ঐ সব আর্য, পাঠান, মোগল ও আরবদের জেনেটিক ল্যাবরেটরিতে যেতে বলব এবং তারা জিন-বিশ্লেষণেই দেখতে পাবেন যে তারা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে এসে 'বঙ্গাল' জিন-এর সংকর বা জাতি-মিশ্রণ-জাত ফসল।

সব শেষে একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রবন্ধের অনেক স্থানে 'বঙ্গাল' শব্দের পাশাপাশি 'বাঙালি' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন লেখক সমকালকে গ্রাহ্য করে। যদি কেউ দু'শত বছরের পুরাতন 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-কে পরিহার করতে রাজি না হন (যদি সঠিক যুক্তি থাকে), তবে তা লেখকের কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে না। তবে এমন ক্ষেত্রে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' প্রবক্তাকে হতে হবে নির্ভেজাল অসাম্প্রদায়িক এবং তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' প্রেক্ষাপটে শিকড় বা উৎসমূল হিসেবে অবস্থান করছে 'বঙ্গাল জাতীয়তাবাদী' উপাদান ও ঐতিহ্য।

[পাঠক যদি বঙ্গাল জাতীয়তাবাদ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান তবে লেখক রচিত এই 'ইহা শব্দ' অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'বাঙ্গাল জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ' পড়ে দেখতে পারেন।]

তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ শরীফ, বাঙলা ও বাঙালিত্ব, কলিকাতা, ১৯৯২

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৌলিন্যমর্যাদার প্রথম ও বর্তমান অবস্থা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫

৩. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, কলিকাতা, ১৯৬৫

৪. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ঢাকা, ২০০৬

৫. গোবিন্দ বর, প্রাসঙ্গিক ভাবনা, গণমুক্তি, ঢাকা, ২০০৬

৬. গৌরপ্রিয় সরকার, জাতিতত্ত্ব সংগ্রহ : নমদের কথা, গণমুক্তি, ঢাকা, ২০০৬

৭. নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১

৮. নীহাররঞ্জন রায়, কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৯

৯. পবিত্র সরকার, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯১

১০. পুস্কর দাশগুপ্ত, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা, ১৯৯৫

১১. প্রবীর ঘোষ, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা, ১৯৯৩

১২. বাংলা একাডেমী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৭

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালির উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলকাতা, ২০০৫

১৪. মঈন চৌধুরী, ইহা শব্দ, ঢাকা, ২০০৬

১৫. মঈন চৌধুরী, শব্দের সম্ভাবনা, ঢাকা, ২০০৭

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, জয় বুকস, ঢাকা, ১৪০৬

১৭. সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কলকাতা, ২০০৭

১৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভাষাচার্য), সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৬

১৯. স্বামী বিবেকানন্দ, স্ত্রী-শিক্ষা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫

২০. হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল, বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫

২১. ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৯

.....****.....

সমাপ্ত